দেবীমাহাত্ম্য ও শিবপুরাণ

গৌতম ঘোষ

ঈশা-দেবীমাহাত্ম্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, আঠারোটি মহাপুরাণের অন্তর্গত অন্যতম একটি। শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচক দুটি জনশ্রুতির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋষি মার্কণ্ডেয়-র নামে এই পুরাণ নামাঙ্কিত। এই পুরাণের সবচেয়ে পরিচিত অংশটি হলো 'চণ্ডী' বা 'দেবীমাহাত্ম্যম্' যা পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে পঠিত হয়ে থাকে। চণ্ডীই প্রাচীনতম জ্ঞাত হিন্দুশাস্ত্র, যেখানে দেবীকে পরম সত্য ও মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বারোচিষ নামে দ্বিতীয় মনুর অধিকার কালে মহর্ষি মেধস এই চণ্ডী মাহাত্ম্য, চৈত্র বংশের রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির কাছে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। পরে ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর শিষ্য ভাগুরিকে সমস্ত মাহাত্ম্যই সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে ঋষি জৈমিনি 'দেবী মাহাত্ম্য' শোনার জন্য মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে যান। সে সময় মুনির সময়ের অভাব থাকায় তাঁর শিষ্য জৈমিনিকে চণ্ডীর কথা শোনার জন্য বিন্ধ্যাচলবাসী মহাজ্ঞানী জাতিস্মর পক্ষী চতুষ্টয়ের কাছে যেতে বলেন। গুরুর নির্দেশ মতো জৈমিনি বিন্ধ্যাচলে গিয়ে পক্ষীদের কাছে নিবেদন জানাতেই তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে দেবীমাহাত্ম্য যেমন শুনেছিলেন তা সমস্তই আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। এরপরেই দেবীমাহাত্ম্য সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী চণ্ডী নামে সুপরিচিত। সাতশ' মন্ত্রে এতে আদ্যাশক্তির দৈত্যদানব বধ প্রভৃতির মহিমকীর্তন করা হয়েছে। এটি হিন্দুদের অনেক ধর্মকার্যে পঠিত হয়ে থাকে এবং বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এটি নিত্যপাঠ্য। শিবপুরাণ-এ আছে —

"সতী নাম তথা কন্যা রুদ্রায় চ মহাত্মনে।
দত্তা দক্ষেণ সা কন্যা ভবানীতি প্রকীর্ত্তিতা।।১৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ গুণাস্ত্রয় উদাহৃতাঃ।
বিষ্ণুঃ সত্ত্বং রজে ব্রহ্ম তমো রুদ্র উদাহৃতঃ।। ২০"

'দক্ষ সতীকে রুদ্রের হাতে সমর্পণ করলেন, এই সতীই ভবানী নামে পরিচিতা হন। ব্রহ্মা রজোগুণের, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের স্বরূপ। লক্ষ্মী সত্ত্বগুণাশ্রিতা, ব্রাহ্মী রজোগুণময়ী, এবং এই সতী তমোগুণাস্বরূপা। রুদ্রকে যে গুণরূপা দেবী আশ্রয় করেছিলেন, তিনিই মহাকালী এবং পরে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে শিবকে আশ্রয় করেন। হিমালয় কন্যা এই পার্বতী পরে কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, বিজয়া, কৌষিকী, দুর্গা, জয়া নামে পরিচিতা হন। এই গুণময়ী দেবীগণ এবং গুণময় দেবতারা মিলিত হয়ে নানারূপ সৃষ্টির কাজ করেছিলেন'। 'দেবীসূক্ত'-এ আছে ---

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ।।৩"

("আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিশ্বরী। আমি পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। আমি ব্রহ্মসাক্ষাৎস্বরূপা সম্বিদ্ বা জ্ঞানরূপা। এই জ্ঞানই যাবতীয় উপাসনার আদি। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা। আমি ভূরিভাবে অনন্তজীবে প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে আমাকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে।[৮])

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়গুলি নিয়ে দেবীমাহাত্ম্যম্ গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে। এই তেরটি অধ্যায় তিনটি চরিত্র বা পর্বে বিভক্ত। খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই নৃতাত্ত্বিক মাতৃপূজাকেন্দ্রিক এক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল।এর প্রভাবে এই গ্রন্থে ঈশ্বরের নারীসত্তার উপরে প্রথম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই গ্রন্থে আর্য ও অনার্য দেবীমাতৃকাকেন্দ্রিক কয়েকটি পুরাণকথাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গ্রন্থিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মবাদিনী নারী বাক্ ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণ-এর আত্মজা। এই ব্রহ্মবিদুষী ঋষিকন্যা পরমাত্মার সাথে নিজের সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করে যে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, তা-ই 'দেবীসূক্ত' নামে পরিচিত। 'দেবীসূক্ত'-ই চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য এরই বিশ্লেষণ মাত্র। কথিত আছে দেবীসূক্ত বেদ, এই সূক্ত ভ্রম-প্রমাদশূন্য ঋষির সম্বেদন; সুতরাং অপৌরুষেয়। পরমাত্মা দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও, চণ্ডীতে মহামায়ারূপেই বর্ণিত হয়েছে। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করার জন্যে দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হতে হয়।

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।১"

"আমি (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা) রুদ্র বসু আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।" অহং

আমি; সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মাই আমি।

পণ্ডিতদের অনুমান খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে ঐই পুরাণটি রচিত হয়েছে। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর অনুবাদ করেছিলেন ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। নবীনচন্দ্র সেন সহ আরও অনেকে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অথবা শুধুমাত্র শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুবাদ করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ দত্ত-এর অনুবাদ সুললিত ভাষায় পয়ার ছন্দে লিখিত। প্রতিটি পংক্তি চৌদ্দ অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত এবং অন্ত অনুপ্রাসে লিখিত। তিনি দাবী করেছেন এটিই বাংলাভাষায় অনূদিত প্রথম 'সপ্তশতী চণ্ডী'। এবং "বঙ্গের ব্যাস ও বাল্মীকি সদৃশ মহাত্মা কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণে যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ করিলাম।"

রাজকৃষ্ণ দত্ত এই 'দেবীমাহাত্ম্য'কে তেরটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আটটি হলো দৈত্য নিধনের ঘটনা। এই দৈত্যরা হলেন —মধু এবং কৈটভ, মহিষাসুর, মহিষাসুরের সৈন্যবাহিনী, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ এবং শুম্ভ। অন্যান্য অধ্যায়গুলি হলো — শক্রাদি, দূত-সম্বাদ, স্তুতি, ফলশ্রুতি এবং বরদান। এগুলি আগে পরে আছে, বিষয় অনুযায়ী সাজানো হয়নি।

সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্যে মহামায়ার তিনটি চরিত্র বা অধ্যায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চরিত্র হলো 'মধুকৈটভ বধ।' এখানে ঋষি ব্রহ্মা। যিনি যেরূপ সম্বেদনের প্রথম দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। এই মধুকৈটভনিধন বা সত্ত্বগুণের প্রলয় বিরাট মনেই সংঘটিত হয়; তাই সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা এই চরিতের প্রথম দর্শক। উপাখ্যানেও দেখতে পাওয়া যায় —ব্রহ্মাই মধুকৈটভ নিধনের প্রথম হেতু।

"নিতৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম।।৪৫।।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।। ৪৬।।"

ঋষি বললেন — মহামায়া নিত্যা ; এই জগৎই তাঁর মূর্তি ; তিনি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তথাপি তাঁর বহু রকমের উৎপত্তির কথা আমার আছে শোন। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যে যখন তিনি আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না বলে অভিহিতা হন।

প্রলয়কালে যখন জগৎ একার্ণবিকৃত হয়েছিল, তখন প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু শেষ-আস্তরণ-পূর্ব্বক যোগনিদ্রার ভজনা করছিলেন। তাঁর নাভিপদ্মের উপর অবস্থান করছিলেন ব্রহ্মা। বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে উৎপন্ন হয়ে দুই অসুর মধু ও কৈটভ, ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। ব্রহ্মা সেই অসুরদ্বয়কে উগ্র এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখে,

হরির নিদ্রাভঙ্গের জন্যে জগদ্ধাত্রী ভগবতী বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী সেই যোগনিদ্রার একাগ্রহৃদয়ে স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা স্তব করছেন —

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।।৫২।।"

মা ! যা বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য, সেই নিত্য অর্দ্ধমাত্রা তুমি। তুমিই সাবিত্রী। হে দেবি ! তুমিই পরা জননী। হে মা ! এই বিশ্ব তোমাকর্তৃক নিয়ত বিধৃত; তুমিই এ জগতের সৃষ্টি ও পালন করছ। হে দেবি ! আবার অন্তকালে তুমিই তাকে ভক্ষণ বা গ্রাস কর। ..... যিনি জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, সেই বিষ্ণু তোমার প্রভাবে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আর কে তোমার স্তব করতে সমর্থ হবে ? বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।/ কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেত।।৬৩।। 'তোমা হতে এ শরীর করেছি গ্রহণ।/ কার শক্তি আছে তব করিতে শ্রবণ।।'

ব্রহ্মা আরও বললেন, "হে দেবি ! স্বকীয় অতি উদার প্রভাবের দ্বারা স্বয়ং সংস্তুত হইয়া এই দুর্দ্দমনীয় অসুরদ্বয়কে মুগ্ধ ও জগৎকর্ত্তা অচ্যুত বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ কর এবং যাহাতে তিনি এই অসুরদ্বয়কে নিহত করেন, সেইরূপ বোধের অনুপ্রেরণা কর।

ঋষি বললেন — "ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এরূপ স্তুত হইয়া তামসী দেবী বিষ্ণুর জাগরণ এবং মধুকৈটভের নিধনের জন্যে, নেত্র মুখ নাসিকা হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া, অব্যক্ত ব্রহ্মার দর্শনবিষয়িণী হইলেন।" যোগনিদ্রা থেকে উঠে জনার্দন জগন্নাথ দেখলেন পরাক্রমশালী মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে। এরপর সর্বসংহারক শ্রীহরির সাথে দীর্ঘদিন ধরে অসুরদ্বয়ের যুদ্ধ হয়। তারা দুজনেই বলোন্মত্ত। 'মহামায়া মায়া বলে হয়ে বিমোহিত।। / কহিল হরিরে বর মাগ হে কেশব।' ভগবান বললেন — যদি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো তাহলে এই বর দাও যে তোমরা দুজনেই আমার কাছে বধ্য হবে। এই প্রার্থনা শুনে তাঁরা বিষ্ণুকে বললেন — 'পৃথিবী যেখানে সলিল-পরিপ্লুতা নয়, সেই স্থানে আমাদের বধ কর।' 'তাহাই হউক' এই কথা বলে ভগবান বিষ্ণু মধুকৈটভের মস্তকদ্বয় নিজের জঘনদেশের উপরে রেখে চক্র দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন করলেন।

দেবীমাহাত্ম্য-এ মেধা ঋষি দেবীর সাথে অসুরদের তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং চণ্ড-মুণ্ড বধের কাহিনি। এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাহিনিটি হলো মহিষাসুর বধের কাহিনি। এই উপাখ্যানটি বাঙালিজীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। এর মূল বিষয় হলো দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুর নিধনের ঘটনা। বাঙলার শিল্পকলা, ভাস্কর্যে, লোকসঙ্গীতে দেবীর এই রূপটির উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। 'আকাশবাণী'র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভদ্রের কণ্ঠে এবং বাণীকুমারের বাণীতে চণ্ডীস্তোত্র ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাঙালির কাছে। এই ভূখণ্ডে দেবী দুর্গা দশভূজা নামে পরিচিতা।

মহিষাসুর পর্ব দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'মহিষাসুর সৈন্য বধ' কাহিনি এবং 'মহিষাসুর বধ'। দেবীমাহাত্ম্যে কাহিনির এই পর্বের সূচনায় আছে — "সকল দেবেরে দৈত্য জিনিয়া সংগ্রামে/হইল মহিষাসুর ইন্দ্র স্বর্গধামে।।" লাঞ্ছিত দেবতারা চললেন দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর এবং মুরারির কাছে। বিস্তারিত জানালেন তাঁরা এই দুই দেবতার কাছে। তাঁদের মুখে এই বিড়ম্বনার কথা শুনে বিষ্ণু এবং মহেশ্বর কুটিল ভাব ধারণ করলেন। তাঁদের শরীর থেকে তেজ নির্গত হতে থাকলো। শুধু তাঁরা নন সেখানে ইন্দ্র প্রভৃতি যত দেবতা ছিলেন তাঁদের সকলের শরীর থেকে একইভাবে তেজ বেরোতে থেকে। সেই তেজরাশি থেকে এক নারীর জন্ম হলো। তাঁকে দেখে তুষ্ট হলেন দেবতারা। একে একে নিজেদের সব অস্ত্র দিয়ে রণসাজে সাজিয়ে দিলেন তেজোসম্ভূতা এই নারীকে। শঙ্কর দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, হুতাশন দিলেন শক্তি, পবন বাণপূর্ণ ধনু, বজ্রপাণি বজ্র, ঐরাবত ঘন্টা, যম দিলেন দণ্ড, অম্বুপতি পাশ, বিধাতা দিলেন কমণ্ডলু আর অক্ষমালা, সমস্ত লোমকূপে রশ্মি দিলেন সূর্য, খড়্গ আর চর্মবর দিলেন কাল, সমুদ্র বস্ত্র অলঙ্কার, বিশ্বকর্মা শাণিত কুঠার। হিমালয় দিলেন তাঁর বাহন সিংহ। এইভাবে রণসাজে সজ্জিতা এবং 'সম্মানিতা' হয়ে দেবী অমর সকাশে/মুহুর্মুহু উচ্চ বাদে অট্ট হাস হাসে।।

সেই উচ্চ হাসিতে এবং রণহুঙ্কার শুনে কেঁপে ওঠে সমুদ্র, বসুধা আলোড়িত হয়, পর্বত টলে যায়। সিংহবাহিনীকে দেখে দেবতারা জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। যুদ্ধের মাঝে অসুর অহংকারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করল। দেবী বললেন —

"গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্
ময়া ত্বয়ি হতেহত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।।

(কিছুকাল তরে মূঢ় কর রে গর্জন। / মম মধুপান নাহি হয় যতক্ষণ।।) এই কথা বলে দেবী লাফ দিয়ে মহিষাসুরের উপরে উঠে পড়লেন। শূল দিয়ে তার গলা কেটে দিলে ভিতর থেকে সে অর্দ্ধ দেহ বার করলো। সেই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ অসুর দেবীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। শেষে মহামায়া অসি বার করে মহিষাসুরের মাথা কেটে ফেললেন। এমতে মহিষাসুর বিনাশ হইল।/ দেবীর মাহাত্ম্য কথা মহিষ সংহার।

মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি যে পূজে শরতে।
আর না জন্মিতে তারে হইবে মরতে।।

দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত তৃতীয় বা শেষ মাহাত্ম্য কাহিনিটি হলো আদ্যাশক্তি মহামায়া কর্তৃক দুই অসুর ভ্রাতা শুম্ভ এবং নিশুম্ভ বধের কাহিনি। কিন্তু এই নিধন পর্বের

আগে মূল গ্রন্থে আরও দুটি অধ্যায় আছে। সে দুটি হলো 'শক্রাদি মাহাত্ম্য' এবং 'দূত সম্বাদ' মাহাত্ম্য। এই অধ্যায়ে দুরাত্মা মহিষাসুর নিধনের পর ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা দেবীর সামনে মাথা নুইয়ে নানাভাবে স্তুতি করেন। তাঁরা বললেন —

সসৈন্য মহিষাসুর কৰি তার দর্পচূর
সমরে করিলা সর্ব্বনাশ
প্রসন্ন তুমি মা যারে, সেই ধন্য এ সংসারে,
ধন যশঃ অক্ষয় তাহার।

অপরাজেয়া দেবী দুর্গা। তাঁর বাহুবলে মুগ্ধ দেবগণ। কিছুদিন আগে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাঁরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মর্ত্যলোকে, পাহাড়ে, অরণ্যে। দেবী শঙ্করী তাঁদের বাসভূমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই ভগবতীর কাছে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেওয়া যায়। তাই তাঁরা বর প্রার্থনা করছেন দেবীর কাছে।

বিপদে পড়ে যখন, করিব তোমা স্মরণ
উদ্ধার করিও কৃপা করি।

শুধু দেবতারা নন, মানবজাতির জন্য একইরকম কৃপা প্রার্থনা করেছেন তাঁরা —

হে অম্বিকে এই স্তব, পড়িবে যেই মানব
তারে তুষ্ট করিও শঙ্করী।।
ধন দারা বিত্ত ঋদ্ধি, বিভব সম্পদ বৃদ্ধি
হয় যেন তার দিনে দিনে।
সদা আমাদের প্রতি, প্রসন্না থাকিও সতী
এই বর মাগি বরাননে।।

দেবতাদের এই প্রার্থনা শুনে মহামায়া বললেন জগতের মঙ্গলের জন্য, আপনাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সব দেবতা মিলে অম্বিকাকে প্রসন্ন করলেই হবে। এই বলে ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হলেন। দেবগণের তেজোরাশি, তাঁদের দেহ থেকে জন্ম যে মহামায়ার সম্ভবত সেই মায়ায় মিশে গেলেন। ত্রিপদী পয়ার ছন্দে এই অধ্যায়টি লেখা।

এর পরের অধ্যায় 'দূত সম্বাদ' মাহাত্ম্য। এখানে দূত হলেন শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দুই দৈত্যরাজের দানব অনুচর সুগ্রীব দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন দেবী অম্বিকার কাছে। কে এই অম্বিকা ? শিবপত্নী পার্বতীর দেহকোষ থেকে জাত এই দেবী। যেহেতু তাঁর জন্ম দেবীর শরীরের কোষ থেকে তাই তাঁর প্রকৃত নাম হয়েছিল কৌষিকী। এরঁ আবির্ভাবের প্রকৃত কারণ হলো, আবার দেবতাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। স্বর্গরাজ্য থেকে তাঁরা বিতাড়িত।

"শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দৈত্য দুই জন।।
ইন্দ্র হৈতে তিন লোক কাড়িয়া লই ল ।

দেবতাএ যজ্ঞভাগ সকলি হরিল।।"

বিপর্যস্ত দেবতারা ভ্রষ্টরাজ্য ফিরে পাবার জন্য অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করলেন। দল বেঁধে সবাই চললেন হিমালয়ে দেবী পার্বতীর কাছে। দেবীর দর্শন লাভের আশায় নানাভাবে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। জাহ্নবী নদীতে স্নান করার অছিলায় দেবী পার্বতী এসে জিজ্ঞাসা করলেন কার স্তব দেবতারা করছেন ? তখন পার্বতীর শরীর থেকে শিবাশক্তি বার হয়ে বললেন — 'শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দুই দানব স্বর্গ হতে দেবতাদের বিতাড়িত করেছেন তাই দেবগণ আমার স্তব করছে।' এই কথা শুনে পার্বতীর দেহকোষ থেকে অম্বিকার এক শক্তি নির্গত হয়, তাঁর নাম হয় কৌশিকী। তাঁর গাত্র বর্ণ কালো হওয়ায় তিনি কালী নামে খ্যাতা হলেন। এই ঘটনাটির উল্লেখ শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় আছে। এই অন্তর্ভুক্তি প্রক্ষিপ্ত কিনা জানা যায় না। শিবপুরাণে আছে —

ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা চৈবং দেবী গিরিবরাত্মজা।
ত্বকোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত।।৯৫
সা ত্বকোশাত্মনোৎ সৃষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ।
কালী কালম্বুদপ্রখ্যা কন্যকা সমপদ্যত।।৯৬

("ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিতা হইয়া সেই গিরীন্দ্রপুত্রী পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ চর্ম্মকোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইলেন। দেহ উৎসৃষ্ট চর্ম্মকোশ হইতে কৌশিকী নামে কৃষ্ণবর্ণা একটি কন্যা উৎপন্না হইল।")

এরপর একদিন দৈত্যরাজদের দুই অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড হিমাচলে মনোহর রূপধারিণী দেবী অম্বিকাকে দেখে দ্রুত গিয়ে শুম্ভকে বললো — "সে নারী রূপ ছটায় হিমাচল জ্বলে/হেন রূপ কেহ নাহি হেরে কোনস্থলে/ কেবা সে সুন্দরী দেবী জানুন সত্বর। গ্রহণ করুন তারে অসুর ঈশ্বর।" চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা শুনে দৈত্যপতি সুগ্রীব দানবকে দূত করে পাঠালেন। অতি শীঘ্র দেবীকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। সুগ্রীব গিয়ে দেবীকে নম্রকণ্ঠে বললো — "ত্রিলোক ঈশ্বর শুম্ভ অসুর প্রধান" আমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সুগ্রীব শতকণ্ঠে বর্ণনা করলো দৈত্যরাজের বাহুবল, ঐশ্বর্য, ত্রিলোকের অধীশ্বর অসুর রাজ শুম্ভ। আপনি তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।" সুগ্রীবের মুখে এসব কথা শুনে মনে মনে হেসে গম্ভীর মুখে দেবী বললেন — 'দূত তুমি যা বললে সবই সত্য কথা। তবে আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে — "যে জন সংগ্রামে মোরে করিবেক জয়/..... সে জন আমার ভর্ত্তা হবে নিশ্চয়।।"

সুগ্রীবের মুখে একথা শুনে শুম্ভ দানব সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠালেন সেই 'দুষ্টবালা'কে কেশ আকর্ষণ করে ধরে আনতে। সেই দানব অম্বিকার কাছে যেতেই তাঁর রণহুঙ্কারে ধূম্রলোচন ভস্মাকার হয়ে গেল। সেনাপতির মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত দানব

সৈন্যরা দেবীর দিকে এগোতেই তাঁর বাহন সিংহ ভয়াল মূর্তি ধারণ করে দানব-সেনাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। এরপর দেবীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে এগিয়ে এলেন চণ্ড ও মুণ্ড দুই দৈত্য সেনাপতি। 'কালী অতি রোষ ভরে' সিংহের উপর আরোহণ করে চণ্ডের প্রতি ধেয়ে গেলেন। তার চুলের মুঠি ধরে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন শিরোদেশ। খড়্গের আঘাতে দেবী কালী একই পরিণতি ঘটালেন মুণ্ডের। শির দুটি কল্যাণী চণ্ডিকাকে এনে দিলে দেবী কালীকে বললেন —

চণ্ড মুণ্ড দুই বীর কাটি এ দোঁহার শির
মোরে আনি দিয়াছ যখন
আজি হতে ধরা ধামে, বিখ্যাত চামুণ্ডা নামে
হবে দেবি তুমি এ কারণ।

এরপর সমবেত দৈত্যসেনা নিধন হলে এগিয়ে এলেন রক্তবীজ। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা এই দানবের। এর শরীর থেকে নির্গত প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে এক একজন করে দানবের জন্ম হয়। তখন চণ্ডিকা কালীকে নির্দেশ দিলেন যত দানব জন্মাবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভক্ষণ করবে। এই কথা বলে দেবী রক্তবীজকে শূলের আঘাতে নিধন করলেন। সেনাপতিদের মৃত্যুর পরে একই পরিণতি হলো দৈত্যরাজ শুম্ভ এবং তাঁর ভাই নিশুম্ভের। দেবতারা নিষ্কন্টক হলে, হৃত স্বর্গ ফিরে পেলে দেবী দুর্গার স্তব করলেন সবাই মিলে। রাজা সুরথ, সমাধি বৈশ্য বর প্রার্থনা করলেন দেবীর কাছে। দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের সর্বোচ্চ দেবী চণ্ডিকা কীর্তিকথা এইভাবেই শেষ হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী মাহাত্ম্যে'র একটি সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক অথবা একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হবে।

> "শাক্তধর্মের বিকাশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য পুরাণসমূহ অনুশীলন করার প্রয়োজন। প্রায় সকল পুরাণেই দেবীর ক্রিয়াকলাপ, নামসমূহ ও গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। তবে দেবী-কেন্দ্রিক পুরাণগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এই পর্যায়ের পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মার্কণ্ডেয় পুরাণ। কালিকা পুরাণ, দেবীপুরাণ ও দেবী ভাগবত অনেক পরবর্তী কালের রচনা, যেগুলি পুরোদস্তর ভাবেই শাক্তধর্মের প্রচারক। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যের দেবী কল্পনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে যে মহিষাসুরের অত্যাচারে নিপীড়িত দেবতাগণ বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার মুখ থেকে ক্রোধজাত যে তেজোরাশির উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে অন্যান্য দেবগণের দেহ-নির্গত তেজ মিলিত হয়ে এক অপূর্ব নারীরূপ গঠিত হয়। ইনি অসুরহন্তা মহাদেবী। দেবীমাহাত্ম্যের নারায়ণী-স্তুতি অংশে তাঁর বিশ্বাধার, বিশ্ববীজ, বৈষ্ণবী শক্তি, মাতৃকা, লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হয়েছে। সর্বশেষে

বলা হয়েছে তিনি বিভিন্ন যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি নানাবিধ নামে অবতীর্ণ হয়ে দানবনিধন ও বিশ্বকল্যাণ করেছিলেন।

দেবী মাহাত্ম্যে দেবীর যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তা তাঁর উগ্ররূপ।পাশাপাশি দেবীর একটি সৌম্যরূপ আছে। সৌম্য রূপের দেবীদের মধ্যে আমরা পৃথিবী-দেবী, শ্রী, শাকম্ভরী, পার্বতী-উমা-সতী প্রভৃতিকে গণ্য করতে পারি। বেদের পৃথিবী-দেবীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পুরাণসমূহে ও মহাভারতে তাঁকে বরাহরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এই পৃথিবী-দেবী থেকেই সীতা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী প্রভৃতি শস্যদেবীরা জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে সীতা ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিতা শস্যদেবী২। পুরাণাদিতে পৃথিবী শ্রী বা লক্ষ্মীর অপর নাম। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বিষ্ণুমূর্তিগুলির

২। ঋগ্বেদ ৪,৫৭; অথর্ববেদ ৩, ১৭, ৪, যজুর্বেদ ১২, ৬৯-৭২; গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪, , ২৭-৩০; পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২, ১৭, ৯-১০; Sacred Books of the East XXIX 334 ; XXX 113-14 ; A.B.Keith, Religion and Philosophy of the Veda (1925), 186.

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শ্রী ও ভূ এই দুই দেবীকে বিষ্ণুর দু'পাশে দেখি। কালিকাপুরাণে১ বলা হয়েছে পৃথিবীই জগদ্ধাত্রী, পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ত্ত্বিদম্।২ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলছেন : অনন্তর আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন পর্যন্ত জগৎ প্রতিপালন করব এবং এইজন্য শাকম্ভরী হিসাবে বিখ্যাত হব।৩ এই শাকম্ভরীই অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় রূপান্তরিত হয়েছেন। পার্বতী পর্বত সম্বন্ধীয়া দেবী, যাঁর সঙ্গে পরে উমার যোগ হয়েছে। পুরাণসমূহে উমা চাপা পড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর বিকাশ হয়েছে বিশুদ্ধ সাহিত্যে সেখানে তিনি জগজ্জননীও বটে, শিবপত্নীও বটে। সতীর প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

১। ৩৭, ২৫-২৮; ২। ৩৮, ৬৩; ৩। ৯১অ।

দুর্গার মধ্যে সৌম্য ও উগ্র উভয় রূপের সংমিশ্রণ হয়েছে। দুর্গা আসলে শস্যদেবী যাঁর প্রতিষ্ঠা ও পূজা নবপত্রিকায়। একটি কলাগাছের সঙ্গে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, অশোক, মান ও ধান্য একত্রে বেঁধে যে শস্য-বধূ নির্মাণ করা হয় তা-ই হচ্ছে নবপত্রিকা। এই শস্যদেবী কিভাবে দানবদলনী হয়ে উঠলেন তার ব্যাখ্যা রমাপ্রসাদ চন্দ এই বলে করেছেন যে মহিষ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দুর্গম প্রভৃতি অসুররা, যাঁদের দেবী বধ করেছেন, আসলে অনাবৃষ্টির রূপক।৪ দুর্গ রক্ষার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল৫ যা তাঁর দুর্গা নামের কারণ হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে অবশ্য বলা হয়েছে দুর্গামি দুর্গ-ভবসাগর-নৌ রসঙ্গা, অর্থাৎ অসঙ্গা

তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকাস্বরূপ বলে দুর্গা। চণ্ডিকা বা অম্বিকা, কখনও কখনও ইনি কৌশিকী নামেও পরিচিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশের নায়িকা। ইনি বহু দেবীকে আত্মসাৎ করে গড়ে উঠেছিলেন। ইনি পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণের কোষ থেকে উদ্ভূত বলে এঁর নাম কৌশিকী (কৌশিকী আসলে কুশ বা কুশিক ট্রাইবের দেবী, যিনি বিন্ধ্যবাসিনী হিসাবেও পরিচিতা)। এই কৃষ্ণবর্ণ কোষ থেকে উদ্ভবের কাহিনীটি নানারূপে পল্লবিত। সবচেয়ে পল্লবিত কাহিনীটি পাওয়া যায় পদ্মপুরাণে৬ যেখানে বলা হয়েছে সতী যখন পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য মেনকার জঠরে ছিলেন তখন ব্রহ্মা একটি গূঢ় উদ্দেশ্যে রাত্রি দেবীকে অনুরোধ করেন যেন তিনি নিজ সত্তা দিয়ে মাতৃগর্ভেই দেবীকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেন। এই কৃষ্ণবর্ণা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়, পরে একদিন শিব তাঁর গাত্রবর্ণ নিয়ে বক্রোক্তি করলে, দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং ব্রহ্মার বরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করে গৌরী হন। দেবীর পরিত্যক্ত কৃষ্ণবর্ণ ত্বক থেকে কৌশিকী দেবী উৎপন্ন হলেন, যিনি চণ্ডিকা, একানংসা, বিন্ধ্যবাসিনী ও রাত্রি নামেও পরিচিতা।

দেবী কালিকা বা কালী সম্পর্কেও অনুরূপ কাহিনী কালিকাপুরাণে বর্তমান যেখানে বলা হয়েছে কৌশিকী-রূপে পার্বতীর দেহ থেকে নিঃসৃতা দেবীই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে কালিকা হলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ

১। ৩৭, ২৫-২৮ ; ২। ৩৮, ৬৩ ; ৩। ৯১অ

৪। R.P. Chanda, Indo Aryan Races (ed N.N. Bhattacharyya 1969) 130 ff

৫। দেবী পুরাণ ৮৩, ৬২-৬৩ ; দেবী ভাগবত ৩, ২৪, ৫-৬ ; হরিবংশ ১২০, ৩৫

সৃষ্টিখন্ড ৪৩-৪৪

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য পার্বতীর কাছে প্রার্থনা জানালে পার্বতীর শরীরকোষ থেকে কৌশিকী দেবী নিঃসৃতা হলেন। কৌশিকী তাঁর শরীর থেক নির্গত হয়ে গেল পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেলেন এবং এইজন্য তিনি হিমালয়বাসিনী কালিকা নামে আখ্যাতা হলেন। অবশ্য দেবীমাহাত্ম্যের অন্যত্র কালীর উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে চণ্ড-মুণ্ড ও অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হলে তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট ফলক থেকে অসিপশারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হলেন এবং চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হলেন। পরবর্তীকালে পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রে এই দেবীর রীতিমত বিস্তারও হয়েছে, শিবের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি ঘটেছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তিনি প্রধান ও পরমতত্ত্ব হয়ে উঠেছেন। সকল কালী মূর্তিতেই দেবী শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান। এই মূর্তি তিনটি বিষয়বস্তুর প্রতীক। প্রথমটি হচ্ছে, তন্ত্রোক্ত এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব যেখানে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই

ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র চালিকাশক্তি। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও অক্ষম; দ্বিতীয়টি হচ্ছে তন্ত্রের বিপরীতবিহারতত্ত্ব (মহাকালেন ছ সমং বিপরীতরতাতুরাম); তৃতীয়টি হচ্ছে, শক্তিদেবীর প্রাধান্য।"

যতগুলি পুরাণ আমাদের সমাজে নিয়মিত পঠিত হয় তার মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত দেবীমাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

শিবপুরাণ

ব্রহ্ম, পদ্ম ইত্যাদি আঠারোটি পুরাণের মধ্যে চতুর্থ পুরাণ হলো শিবপুরাণ। এই পুরাণগুলি মহাপুরাণ বলেও উল্লিখিত হয়। আমাদের দেশে দুটি শিবপুরাণ-এর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং দু'টিই মহাপুরাণ বলে কথিত অর্থাৎ সমান মর্যাদার অধিকারী। আঠারোটি পুরাণের নাম উল্লেখ করে যে তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে দু'একটি তালিকায় শিবপুরাণের পরিবর্তে বায়ুপুরাণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুরাণ হলো শিবপুরাণ এবং এর রচয়িতা হলেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি ভারতীয় এপিক 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। যদিও আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন 'মহাভারত' কোনো বিশেষ একজনের কিম্বা এক কালের রচনা নয়। শিবপুরাণ সম্বন্ধে এ ধরনের কোনো কথা শোনা যায় না।

পুরাণগুলির বিষয়বস্তু মোটামুটি একইরকম। বিষ্ণুপুরাণে এই পুরাণসমূহের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা আছে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।" (৩/৬/২৪)

একথার অর্থ হলো – "পুরাণগুলির সৃষ্টি, (প্রলয়ের পর) নতুন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশাবলী —এই পাঁচটি বিষয় লইয়া রচিত।" বেদব্যাসের শিবপুরাণ সুবিশাল গ্রন্থ। বিষ্ণুপুরাণ শিবপুরাণ-এর চেয়ে প্রাচীন হলেও এর নির্দেশিত নীতি শেষোক্ত পুরাণে বহুলাংশে অনুসৃত হয়নি। এই শিবপুরাণে শিবতত্ত্ব, শিবের মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব, শিবের স্বরূপের বিভিন্ন নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। বংশাবলী বলতে রুরু, আড়ী, বরাহরূপী মূক ইত্যাদি দৈত্যের, হিরণ্যকশিপু বধের নানারকম উপাখ্যান, সত্যব্রত ও সগর রাজার বিবরণ ইত্যাদি লিখিত আছে। শিবপুরাণ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে সাধনতত্ত্ব। অন্য কোনো পুরাণে এসব বিষয় তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। এর ফলে শুধু শৈব সম্প্রদায় নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও এই গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এই সুবিশাল গ্রন্থটির মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি বাংলা হরফে রেখে সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

করেছেন পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। ঠিক কোন সময়ে তিনি এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন তার কোনো উল্লেখ এই বইতে নেই। হয়তো বা অন্য কোনো সংস্করণে আছে। কিম্বা আদৌ কোথাও উল্লেখ করেননি। অধ্যায়গুলির শিরোনাম নেই। দু'একটি এরকম বিচ্যুতি ব্যতীত সমগ্র অনুবাদটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৮৬৬ সালে ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ায় পঞ্চানন তর্করত্নের জন্ম। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। এরপরে বিখ্যাত পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্করত্ন' উপাধি পান। যোগেশচন্দ্র বসুর আর্থিক সাহায্যে উনিশটি সংহিতার অনুবাদ শুরু করেন। ১৯২৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন, কিন্তু হিন্দুর সমাজরীতি বিরোধী 'সারদা আইনের' প্রতিবাদে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। হিন্দুশাস্ত্র, বিবিধ দর্শনের উপর অনেক বই লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। চার বছর 'জন্মভূমি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই রক্ষণশীল ধর্মভীরু পণ্ডিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

বেদব্যাসের শিবপুরাণ ছয়টি সংহিতায় বিভক্ত। এগুলি হলো জ্ঞান সংহিতা, বিদ্যেশ্বর সংহিতা, কৈলাস সংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, বায়বীয় সংহিতা এবং ধর্ম্মসংহিতা। সংহিতাগুলি আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে 'জ্ঞানসংহিতা'ই হলো বৃহত্তম, মোট আটাত্তরটি অধ্যায়ে বিস্তৃত এবং ক্ষুদ্রতমটি বারো অধ্যায়ে সীমিত 'কৈলাস সংহিতা'। একমাত্র বায়বীয় সংহিতায় ত্রিশটি করে দু'টি অধ্যায় নিয়ে পূর্বভাগ এবং উত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমগ্র শিবপুরাণ দুশো উননব্বইটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

সূচিপত্রকে অনুসরণ করে অধ্যায়গুলির কোনো শিরোনাম দেওয়া হয়নি। এর ফলে পাঠ করবার সময়ে পাঠককে বারংবার অসুবিধায় পড়তে হয়। এই শিরোনাম না দেওয়া কিন্তু অনুবাদকের ভুল নয়, এই ত্রুটি গ্রন্থ রচয়িতা স্বয়ং বেদব্যাসের। মূল গ্রন্থে কোথাও এরকম কোনো উল্লেখ নেই। মূল গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো পাঠ্য বিষয় বা অধ্যায়গুলির মধ্যে পারম্পর্য থাকায় কোনো একটি বিষয় বিস্তারিত জানা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় 'জ্ঞান সংহিতা'-র বত্রিশ থেকে ছত্রিশতম অধ্যায়ে গণেশ চরিত্র, গণেশের শিরশ্ছেদনসহ সবই লিখিত হয়েছে গণেশ প্রসঙ্গে। এর ফলে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারিত জানা যায় এবং এই থেকে আগ্রহ বাড়ে পাঠকের। আবার এই রীতির ব্যতিক্রমও দেখা গেছে বারবার।

সংস্কৃত সাহিত্যের এই আকর গ্রন্থটির অনুবাদ, এর সামাজিক ভূমিকা এবং বাঙালি সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করার আগে এই গ্রন্থের মূল উপাদান শৈবধর্মের ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে

কিছু জানতে পারি। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস'-এ বলেছেন — "বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতা থাকলেও তা কোনদিন বেদকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু কোন কোন শৈব সম্প্রদায় বেদপ্রামাণ্য মানতে অস্বীকার করেছিল। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেনকলই শাখা জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিল না, মধ্ব জাতিভেদ মানতেন না, রামানন্দ সম্প্রদায়, চৈতন্য, প্রভৃতিরা নিম্নশ্রেণীর কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কোন কোন শৈব সম্প্রদায় এবিষয়ে আরও স্পষ্টতা দেখিয়েছিলেন। উগ্রপন্থী শৈব সাধকেরা ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকে খোলাখুলি অস্বীকার করেছিলেন। কাশ্মীর শৈবরা জাতিভেদ মানতেন না, আর বীরশৈবরা দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক ছিলেন। তাঁরা শুধু জাতিভেদই বর্জন করেননি, নারীর সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ বিরোধিতা এবং বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে ঘোরতর উৎসাহী ছিলেন।"(পৃঃ ১৯৬)

উপরের এই উদ্ধৃতিটুকু সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। ধর্মের প্রসঙ্গে বঙ্গদেশ তথা পূর্ব-ভারতের অধিবাসীদের মানসিকতা সে সময় আরও কঠোর ছিল। আর্য আগ্রাসনের পরে বৃহত্তর বঙ্গের মানুষ আর্য সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিল। বৈদিক ধর্মের প্রসার ঘটলে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক ধর্মাবলম্বীরা এই ভূখন্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বস্তুত, বেদ-বিরোধী এই তিন ধর্মের জন্মস্থান এবং লালনভুমি ছিল পূর্ব-ভারত।

আর্য-বিরোধী মনোভাব এবং বাংলাদেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে আর্যধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব পৌঁছুতে অনেক সময় লেগেছে। 'সনাতনত্বের প্রতি বাঙালির বিরাগ নিয়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থের প্রাঞ্জল বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

"এই সব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা মধ্যগাঙ্গেয় ভারত, অর্থাৎ আর্য-ভারত হইতে পৃথক। আর্য ভারতবর্ষ সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল, সমস্ত আচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ ও পরিবারবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্র দ্বারা শাসিত। আর্য-ভারত রক্ষণশীল, যাহা সে পাইয়াছে তাহা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তন বিমুখ। শতাব্দী পর শতাব্দী ধরিয়া যে মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে কোনও বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, বা দিলেও তাহা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। ইতিহাসের এ তথ্য বিস্ময়কর, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। ইহার প্রধান কারণ, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব। বাঙলাদেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-কালচক্রযানী ও সহজযানী রূপান্তর ; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন ; ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর ; বৈষ্ণবধর্মে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার ; শিব ও উমার ভাবকল্পনায় পারিবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সঞ্চার ; দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, মারীচী,

পর্ণশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও অনুরাগ, শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকেও ঘনিষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রতি পারিবারিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার, তান্ত্রিক কায়াসাধনের প্রতি অনুরাগ এবং সেই সাধনের রীতিপদ্ধতি ; শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ; বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা ; বাঙলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই আর্যমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক ও সনাতনত্বের বিরোধী। দুঃসাহসী সমন্বয়, স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; সনাতনত্বের প্রতি বিরাগ যেন বাঙালার ঐতিহ্য ধারায়।" (পৃঃ ৮৮১)

গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত বাঙালি সমাজে আর্য বিরোধিতা প্রকট ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখনও যথেষ্ট ছিল। কৃষ্ণ উপাসনার সাথে সাথে শৈবধর্মেরও প্রভাব ছিল। একই সঙ্গে ছিল প্রাচীন বাঙলার লৌকিক ধর্ম। শিবপুরাণ-এর পৌরাণিক কাহিনি 'দক্ষযজ্ঞ' আজ বাঙালি জীবনে লোককাহিনি হিসাবে পর্যবসিত হয়েছে। এর লোকপ্রিয়তা এতখানি বেশি যে এই কাহিনি যাত্রা, নাটক বা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে বারবার। শিবপুরাণে আছে ---

"পূর্ব্বং দক্ষস্য রুদ্রস্য স্পর্দ্ধা জাতা মহাত্মনোঃ।
ততো দক্ষঃ স্বয়ং যজ্ঞং কৃতবনে দেবসন্নিধৌ।। ৭/২
অনাহুয় তদা রুদ্রং পূর্ব্বঞ্চর্ষিসমন্বতঃ।
ততো দেবী সতীনাম্নী পিত্রানাকারিতা যদা।। ৭/৩
তদা গতা পুনস্তত্র নহূতাপি পিতৃগৃহে।
প্রাপ্যাবজ্ঞাস্তু সা তত্র দেহত্যাগমথাকরোং।।৭/৪

"পূর্বে দক্ষ এবং রুদ্র, এই দুই মহাত্মার মধ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা হয়; সেই স্পর্দ্ধাবশতঃ দক্ষ দেবগণের সম্মুখে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে রুদ্রদেবকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সতীদেবীও পিতা কর্ত্তৃক আহূতা হন নাই। কিন্তু সতীদেবী অনাহূতা হইয়াই পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া আপনার দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

এর পরের কাহিনি বাঙালিমাত্রেই জানেন। কিন্তু এর কারণ কী ছিল ? শিব কর্তৃক যজ্ঞনাশ হলে দক্ষ বলেছিলেন তিনি শূলধারী জটামুকুট বিশিষ্ট একাদশ রুদ্রকে চেনেন কিন্তু শিব বা মহেশ্বরকে চেনেন না। শিবপুরাণে আছে — "শিবতত্ত্বং বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিচারতঃ"। (১/৮) বেদজ্ঞ ঋষিরা এই প্রশ্ন করেছিলেন। এর থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয় যে শিব বৈদিক দেবতা ছিলেন না। আর বৈদিক নন বলেই বাঙালিরা পৌরাণিক যুগ থেকে শিবের আরাধনা করছেন। দক্ষযজ্ঞের

পর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু শিবকে বৈদিক দেবতা হিসাবে মান্যতা দিয়েছিলেন। 'শিবপুরাণ' রচনার সময় বেদব্যাস সম্ভবত ভারত-ইতিহাসের ক্রমাঙ্ক অনুসরণ করেননি। দক্ষের যজ্ঞনাশের পরেই বর্ণশ্রেষ্ঠ দেবতারা রুদ্র শিবের মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন। অথচ, এই পুরাণের সূচনাতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলছেন — "দেবদেব ! আমরা তোমার রূপ জানিতে অক্ষম, যাহা হউক, তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার।" শিবপুরাণে বলা হচ্ছে 'শিব্রুদ্রাদি নামভেদ মাত্র ; বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।' এখানে কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা হয়নি। আগে যজ্ঞনাশ পরে শিবের মহত্ত্ব স্বীকার, শিবপুরাণ-এ এর বিপরীতটাই ঘটেছে।

ভারতীয় পুরাণগুলি সীমাহীন সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে বারবার। শিবতত্ত্ব জানার পর শিবপূজার বিধির নির্দেশ দেওয়া আছে এই পুরাণে। "প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যথাবিধি শয্যা হইতে উত্থান করিবে। ... তাহার পরে বিধিপূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ এবং শুভনাম গ্রহণ করিবে। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করত দক্ষিণদিকে গমন করিয়া মলোৎসর্গ করিবে। নির্জ্জন স্থানে মলত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ পাঁচবার বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লেপনপূর্বক শৌচ করিবে। ক্ষত্রিয় চারিবার, বৈশ্য তিনবার এবং শূদ্র দুইবার ঐরূপ শৌচের বিধান করিবে। .... স্ত্রীদিগের মৃত্তিকাহরণাদি শৌচকার্য্য শূদ্রের তুল্য।" এই অনুশাসন থেকে সেকালের সমাজব্যবস্থার একটি খণ্ডচিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সামান্য শৌচকার্যেও বর্ণাশ্রম প্রথার বিধিনিষেধ। আর গার্গী, মৈত্রেয়ীদেরও কালে সমাজে নারীর অবস্থান সবার নিচে।

শিবপুরাণ-এ বেদব্যাস শিবস্তব, শিবপূজা বিধি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্ঞান 'সংহিতা'র ছয়টি অধ্যায়ে, কৈলাস সংহিতার চারটি এবং বায়বীয় সংহিতায় দু'টি অধ্যায়ে শিবপূজা বিধি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শুধু শিবের পূজাবিধি নয় গণপতিসহ শিবপূজা এবং পার্বতী সহ শিবপূজার কথাও উল্লেখ করেছেন। নির্দেশ অনুযায়ী এই পুরাণের শিবপূজা নিতান্তই আড়ম্বরহীন। নানারকমের তণ্ডুল, কুশ, শিব-আকন্দ, কর্পূর, নানারকমের ফুল ও চন্দনের প্রলেপ, প্রাণায়াম করে শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি পূজা করতে হয়। পরিশেষে মূর্তির মাথায় জল ঢালতে হয়। "জলধারাসহস্রেণ শতমেকোত্তরেণ বা কর্ত্তব্য / বেদমার্গেন নামভির্ব্বাথ বা পুনঃ।" বাঙালির কাছে শিব ঘরের মানুষ, বৈদিক দেবতা নন। তাঁরা, বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা এতসব আচার অনুষ্ঠানকে সংক্ষেপ করে শুধুমাত্র শিবের মাথায় জল ঢেলে পূজা সারেন। এই পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো "ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণের প্রতি শিবপূজা বিধি কথন।"

যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন। পর্বতের মেয়ে বলে তাঁর নাম হয় পার্বতী। অন্যদিকে ব্রহ্মার বর পেয়ে দৈত্যরাজ তারকাসুর অজেয় হয়ে উঠেছেন। দেবতারা বাস্তুচ্যুত হন। নিরুপায়

দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা বললেন — "শিববীর্য্যসমুৎপন্নঃ পুত্রশ্চৈনং হ্বনিষ্যতি।" এর পরে ঘটে যায় একটার পর একটা ঘটনা। গভীর যোগনিদ্রায় শিব, দেবতাদের অনুরোধে শিবকে আরাধনার জন্য পার্বতীকে পাঠালেন গিরিরাজ, শিবের তপোভঙ্গ, মদনভস্ম, পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ শিব। ঋষিদের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন তিনি, বরানুগমন, শিবকে দেখে মেনকার খেদ, দেবতাদের পরামর্শে মেনকার সম্মতি, বিবাহ এবং স্কন্দের জন্ম। দশম থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হর-পার্বতীর মিলন কাহিনি। হয়তো বা এই অধ্যায়গুলিই ছিলো কালিদাস-এর 'কুমারসম্ভব' কাব্যের উপাদান।

উত্তর ভারতের রক্ষণশীল সনাতন ধর্মালম্বীরা গোরুকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন। এই প্রতীতি বা বিশ্বাস তাঁদের কিভাবে হলো ? বস্তুত, শিবপুরাণ হলো এর মূল উৎস। এই গ্রন্থে আছে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া গোরুর মহিমা নিয়ে নারদ বললেন —

"যস্যাশ্চ দক্ষিণে শৃঙ্গে গঙ্গা চ পরিতিষ্ঠতি।৪৪
বামে চ যমুনা দেবী মধ্যে চ সরস্বতী।
স্কন্ধে ব্রহ্মা তথা মধ্যে রুদ্রঃ সপরিবারকঃ।৪৫
কট্যাং বিষ্ণুঃ সদা তিষ্ঠেং পশ্চাৎ তীর্থান্যনেকশ"।
ঋষয়োঃ দক্ষিণে কুক্ষৌ বামে সর্বাশ্চ দেবতাঃ"

চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণী যাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে নানা দেবদেবীর অধিষ্ঠান "ঈদৃশীঞ্চৈব গাং যো বৈ পূজয়িতা চ প্রক্রমেৎ।/ পৃথ্বীপ্রক্রমণাজ্জাতং ফলং তস্য সুনিশ্চিতম্।৪৮ এই গোরুকে "যে ব্যক্তি পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করে, সে নিশ্চয় পৃথিবীপ্রদক্ষিণ জন্য পুণ্য লাভ করে।" শুধু তাই নয় — "মানব যাহার দুগ্ধ পান করিয়া গঙ্গোদকপানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং যাহার বিষ্ঠা বা মূত্র পান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সে গোরুর সকল অঙ্গই পবিত্র।" এসব কারণে উত্তর ভারতের গো-বলয়ে আজও গোরু একটি শ্রদ্ধেয় প্রাণী।

পার্বতী-তনয় গণেশ-এর জন্ম ও শিরশ্ছেদন নিয়ে নানারকমের মিথ বাঙালি সমাজে পাওয়া যায়। বাঙালিরা অনেক রকমের ষষ্ঠী পুজো করে, তার মধ্যে একটি হলো 'দুর্গা ষষ্ঠীর কথা'। এর মধ্যে গণেশকে নিয়ে দুটি প্রচলিত কাহিনি আছে। তার মধ্যে গণেশের জন্মবৃত্তান্তের ব্যাপারে শিবপুরাণ-এর কাহিনির অল্পবিস্তর মিল আছে। 'মেয়েদের ব্রতকথায়' আছে তেল মাখতে মাখতে পার্বতী গায়ের ময়লা দিয়ে একটি পুতুল গড়েন। নারায়ণ ঐ পুতুলে আবির্ভূত হন। এই পুতুলই হলেন গণেশ। শিবপুরাণ-এ পার্বতী জল থেকে পাঁক তুলে "সর্ব্ববয়বনির্দ্দোষং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্" গণেশকে সৃজন করলেন। অন্য কাহিনিটিতে আছে গণেশের জন্ম হলে শিব সব দেবতাকে আমন্ত্রণ জানান ছেলে দেখতে। দুর্গার ভাই গণেশের মামা শনিও

এসেছিলেন ছেলে দেখতে। 'তিনি জোর করে যখন ছেলের দিকে চাইলেন ছেলের মুণ্ড উড়ে গেল, রক্তে গা ভেসে গেল।' তার পরের ঘটনা একইরকম। সবারই জানা। শিব বললেন —"দেখ নন্দি, যদি কেউ উত্তর দিকে মাথা ক'রে শুয়ে থাকে তার মাথাটা কেটে আন।" শিবপুরাণ-এর এই কাহিনি তিনটি অধ্যায় জুড়ে আছে। বালক গণেশকে শিবাণী কৈলাসের দ্বাররক্ষক করে দিলেন এবং বললেন —"হে পুত্র ! যে ব্যক্তি আমার গৃহমধ্যে আসিবে, তাহাকে নিবারণ করিবে। .....তুমি এক্ষণে আমার দ্বারপাল হও।" এইরূপ কহিয়া গণেশকে যষ্টি ধারণ করাইয়া দ্বারে সংস্থাপন করিলেন। আগে দ্বাররক্ষী ছিলেন প্রমথগণ। তাঁরা ঢুকতে চাইলে গণেশ তাঁদের যুদ্ধে হারান এবং তাড়িয়ে দেন। এইভাবে অন্যান্যদের সাথে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে গণেশ নিবারণ করেন। শেষে শিবের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে বিরক্ত শিব গণেশের শিরশ্ছেদন করেন। এখানে কেউই এই কাহিনি নির্মাণে শিবপুরাণকে অনুসরণ করেননি।

বাংলায় বৈষ্ণব এবং শৈব এই দুটি ধর্মমতই প্রবল ছিলো। এই কারণে বংশীধারী কৃষ্ণ ব্যতীত বিষ্ণুর নানারকমের মূর্তি পাওয়া যায়। শিবমূর্তি পাওয়া গেলেও শিব সাধারণত লিঙ্গরূপে পূজিত হন। পূর্বভারতে বিশেষ করে বৃহৎ বঙ্গে যে সব প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রচুর সংখ্যক শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। এখনো বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে যে ছোট ছোট মন্দিরগুলি আছে তাতে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত আছে বেশি।

আমাদের আলোচ্য শিবপুরাণ-এর কয়েকটি অধ্যায়ে 'প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ ও উপলিঙ্গ', 'জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি', 'লিঙ্গ মাহাত্ম্যদি বর্ণন', 'লিঙ্গপূজা','লিঙ্গদর্শন' ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। লিঙ্গ সম্পর্কে শিবপুরাণ-এ স্বয়ং বিষ্ণু বলছেন —

"সর্ব্বে বিনষ্টাঃ প্রধ্বস্তাঃ শিবেন রহিতা যদা।
তস্মাৎ সদা পূজনীয়ো লিঙ্গমূর্ত্তিধরো হরঃ।।২৪
যদি সুখং সুরেশাশ্চ নৈরন্তর্য্যং ভবেদিহ।
পূজনীয়ঃ শিবো নিত্যং শ্রদ্ধয়া দেবপুঙ্গবৈঃ।। ২৫
সর্ব্বলিঙ্গময়ো দেবঃ সর্ব্বলিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ।। ২৬

"যদি নিরন্তর সুখলাভ বাসন থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা লিঙ্গমূর্ত্তিধর হরকে পূজা করা উচিত। এক্ষণে এই দেবপুঙ্গবগণেরও দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, সে সর্ব্ব লিঙ্গে অন্তর্যামিরূপে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বলিঙ্গময় দেব শিবকে পূজা করা কর্ত্তব্য।"

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই লিঙ্গ উপাসনা এবং পরবর্তীকালে লিঙ্গের সঙ্গে শিবের গভীর ও ব্যাপক সংযোগ হয়। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদরোর প্রত্ন নিদর্শনগুলির মধ্যের এই লিঙ্গগুলি এই প্রাচীন ইতিহাসকে সমর্থন করে। লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে

সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাচীন এই ধারণা ও এর ক্রমিক পরিবর্তন নিয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য —

"হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসে লিঙ্গ উপাসনার এমন গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের কারণ এই যে অন্যান্য দেশের নানা ধর্মবিশ্বাসের মতই এখানকার ধর্মবিশ্বাসও এক আদিম উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস থেকে জন্মলাভ করেছিল। ঋগ্‌বেদে শিশ্নদেব বা লিঙ্গ উপাসনা নিন্দিত হলেও পরবর্তীকালে এই উপাসনার ব্যাপকতা বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি।

কিভাবে লিঙ্গ ও যোনি পূজা শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তার ইঙ্গিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়।২ গোড়ার দিকে লিঙ্গ ও যোনি স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হতো। প্রাক্-গুপ্ত যুগের যেসব শিবলিঙ্গ বা তার চিত্র মুদ্রায় বা সীলে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তীকালের যোনিপট্ট অনুপস্থিত। এই যুগের একটি বিশেষ মূর্তির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই মূর্তিটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের। সংশ্লিষ্ট লিঙ্গটি ঊর্ধ্বোত্থিত, মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের আকারে রূপায়িত।৩ মথুরা ও লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতকের যে সকল যোনিপট্টহীন শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে সেগুলি মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের পুরোদস্তুর অনুকরণ। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি মুদ্রার একদিকে শিবের মনুষ্যমূর্তি, অপর দিকে তাঁর লিঙ্গ মূর্তি অঙ্কিত আছে।৪ শৈবধর্মে তান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনির যুক্তরূপ অধিকতর জনপ্রিয় হয়।

শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্ট যুক্ত হবার পর লিঙ্গের মুক্তমুখচর্ম ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ পূজাপ্রতীক রূপে লিঙ্গ আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দেখা যায় যে উপমন্যু কৃষ্ণের সম্মুখে এই বলে শিবের গুণগান গাইছেন যে শিবই একমাত্র দেবতা যার লিঙ্গ ব্যাপকভাবে পূজিত হয়। পূজাপ্রতীক হিসাবে লিঙ্গ এতদূর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম এবং মুখ্য পূজার বস্তু হিসাবে লিঙ্গই অধিষ্ঠিত হয়। শিবের মনুষ্য মূর্তি গৌণ হয়ে ওঠে। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের গর্ভগৃহে যে মূল দেবতাটি স্থান পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন লিঙ্গ, মনুষ্য মূর্তিগুলির স্থান অন্যান্য গৌণ স্থানে। একথা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ক্ষেত্রেও সত্য।

---

১ Marshall, op-cit, I 68-63, Vats, op-cit, 26, 51 ff 116, 368 ff

২। ৪, ১১,৫,২।

৩ J.N.Banerjea, Development of Hindus Iconography (1956) 456-57

৪ J. Allan, Coins Of Ancient India (1936) 85, 233,245

মহেশ্বরের লিঙ্গশরীর আবির্ভাবের কারণ জানতে চাইলেন সনৎকুমার — "শ্রোতুমিচ্ছামি যোগীন্দ্র লিঙ্গাবির্ভাবলক্ষণম্।।২৬ নন্দিকেশ্বর বললেন — "....

বহুকাল অতীত হইলে একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর সমরাসক্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের অভিমান দূরীকরণার্থ ত্রিগুণাতীত ভগবান্ মহেশ্বর, উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে স্তম্ভরূপে অবির্ভূত হইলেন। পরে সেই স্তম্ভে স্বীয় লিঙ্গচিহ্ন নিবন্ধন জগত্রয়ের হিতকামনায় তাহা হইতে নির্গুণ লিঙ্গ প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি ত্রিলোক মধ্যে পরমেশ্বর শঙ্করের নির্গুণ লিঙ্গ ও সগুণ কলেবর পূজা বিষয়ে কল্পিত হইতেছে।" শুরুতে যোনিলিঙ্গ সৃষ্টি হয়নি। সে অনেক পরের কথা।

রামায়ণ এবং মহাভারত-এর শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি বেশ কিছু শিবপুরাণ-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফল্গুনদীর তীরে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করার সঙ্কল্প করলে শ্রাদ্ধের জিনিষ সংগ্রহ করতে লক্ষ্মণকে কাছের গ্রামে পাঠান। তাঁর আসার দেরি দেখে রামচন্দ্র ভাইকে খুঁজতে যান। স্বামী এবং দেবরের ফিরতে দেরি হচ্ছে অথচ বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে সীতা শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করেন। পরলোকগত দশরথ এবং অন্যান্যরক খুশি হয়ে পিণ্ড গ্রহণ করেন। পরে এই কথা রামকে বললে তিনি অবিশ্বাস করেন। তখন সীতা কেতকী ফুল, ফল্গু নদীসহ এবং অন্যান্য অনেকের সাক্ষ্য মেনেছিলেন। তাঁরা অস্বীকার করলে সীতা কেতকী ফুলকে মিথ্যাচারণের জন্যে অভিশাপ দেন — "কেতকি ত্বং শিবায়েহ্ ন যোগ্যা ভব সর্ব্বদা।" সেই থেকে কেতকী ফুল দিয়ে শিবপূজা হয় না। এছাড়াও আছে 'কুম্ভকর্ণ বধের কাহিনি', 'অরুন্ধতী ও দেবগণের সংবাদ,' 'বিশ্বামিত্র ও শ্রীরামের কামাধীনত্ব কথন', 'সত্যব্রত ও সগর রাজার বিবরণ কথন' এছাড়া আছে সূর্যবংশের দীর্ঘ বর্ণনা। মহাভারত-এর 'পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার প্রীতি উৎপাদন', 'ভীলবেশী শিবের সাথে অর্জুনের যুদ্ধ' ইত্যাদি আছে।

ভারতবর্ষ তীর্থময় দেশ। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তীর্থ ছড়িয়ে আসমুদ্রহিমাচল এই ভূখণ্ডে। শিবপুরাণ-এর প্রথম তীর্থমাহাত্ম্য আছে বায়বীয় সংহিতা-র ঊনচল্লিশতম অধ্যায়ে। নন্দিকেশ তীর্থ মাহাত্ম্য। এছাড়া আছে শিবতীর্থ নাগেশ, রামেশ্বর, মুক্তেশ্বর শিব মাহাত্ম্য। কয়েকটি সংহিতায় অনেকগুলি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বেশরের প্রধান অধিষ্ঠানস্থল কাশী-মাহাত্ম্যের কথা। 'বিশ্বেশর মাহাত্ম্য', 'পঞ্চকোশী কাশীর কথা', 'গৌরীর প্রতি শিবের মাহাত্ম্য কথন' ইত্যাদি। বিশ্বেশর সংহিতায় আছে 'শিবতীর্থ সেবা মাহাত্ম্য', সনৎকুমার সংহিতায় আছে 'হরপার্ব্বতী সংবাদে কাশী-মাহাত্ম্য'। বাঙালি হিন্দু সমাজে একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যে 'কাশীমরণ মাত্রেই মোক্ষপ্রাপ্তির শঙ্কানিরাস'। এজন্যে এখনও সংসার পরিত্যক্ত বর্ষিয়সী বিধবাদের অন্তিম বাসনা হলো কাশীবাস। শেষজীবন কাশীতে অতিবাহন করবেন বলে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাশীতে বসতবাটী আছে। এই বারাণসী নিয়ে পার্বতীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শঙ্কর বলেছেন — "এই মদীয় বারাণসী ক্ষেত্র সকল জীবেরমুক্তি হেতু। ভদ্রে! সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধগণ এই বারাণসি

ক্ষেত্রে মৎস্যলোক প্রাপ্তি কামনায় জন্ম ত্রিপুন্ড্রাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মদীয় ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়ত পরম যোগ অভ্যাস করেন।" ...."সোহন্তকালে চ যস্যৈব পার্শ্বে পরিবিবর্ত্ততে/তস্য মুক্তির্ভবেন্ন্যু স্বস্ত কিং ন ভবেৎ পুনঃ।১৬" "মৃত্যুকালে যে ব্যক্তির সমীপে উক্তরূপ পুরুষ অবস্থান করেন, নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাইয়া থাকে; সুতরাং তাহার নিজের মুক্তিলাভ অবিসংবাদিত তীর্থ, হরি বা আমার অপেক্ষা তাহাকে করিতে হয় না।" একই রকম মুক্তির সুযোগ আছে শিবরাত্রি ব্রত পালন করলে।

শিবপুরাণ-এ অনেক চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। গণেশ চরিত্র ব্যতীত গৌতম চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, নারায়ণের অবতার নৃসিংহ চরিত্র আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বায়বীয় সংহিতায় মহর্ষিগণের শিবচরিত্র কীর্তন।

"চরিত্রাণি বিচিত্রাণি গুহ্যানি গহনানি চ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানি দেবস্য মোহয়ন্তি মনাংসি নঃ।১
শিবয়োস্তত্ত্বসম্বোধে ন দোষ উপলভ্যতে।
চরিতৈঃ প্রাকৃতো ভাবস্তয়োরপি বিভাব্যতে।।২

"ঋষিগণ বলিলেন, —মহাদেবের বিচিত্র, গুহ্য, গহন এবং দুর্ব্বিজ্ঞেয় চরিত্র সকল আমাদের মন মোহিত করিতেছে। সেই শিব ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত কোনরূপ তর্ক করার বিশেষ দোষ আর লক্ষিত হয় না।"

শিবপুরাণ মহাকাব্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করেছেন। শিবের শ্মশানবাসের হেতু, ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রতি শিবের বরদান, শিবপূজা বিধি, হিরণ্যকশিপু বধ, ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি, সপ্তদ্বীপ বর্ণনা, নরকের বর্ণনা, ব্রহ্মা হইতে মহাদেবের উদ্ভব, বীরভদ্র ও কালীর উদ্ভব, মন্বন্তর বর্ণনা ইত্যাদি। আমরা দেবী শারদার দুপাশে কার্তিক আর গণেশের মূর্তি দেখি। দেখলে মনে হবে দুই ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাইয়ের মধ্যে কতই না প্রীতির সম্পর্ক। শিবপুরাণ অবশ্য অন্য কথা বলে। এই দুজনের মধ্যে ভীষণ রকমের বৈরিতা ছিল। গণেশের বিয়ে উপলক্ষে কার্তিকের ক্রোধের কথা শিবপুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে।